পঞ্চম অধ্যায়

বায়ুমণ্ডল

Atmosphere

আমরা জানতে পেরেছি এখন পর্যন্ত মহাকাশে আবিষ্কৃত সৌরজগতের বাসযোগ্য আদর্শ গ্রহটি হচ্ছে পৃথিবী। ভূপৃষ্ঠের চারদিকে জীবজগতের প্রাণ ধারণের প্রয়োজনীয় বায়ুর উপাদান বেষ্টিত রয়েছে। এটাকে আমরা বায়ুমণ্ডল বলি। এই বায়ুর উপাদানসমূহ কয়েকটি স্তরে বিভক্ত হয়ে অবস্থান করছে। এগুলো পৃথিবীর মানুষ ও অন্যান্য জীবজগতের জন্য কত দরকার, তা আমরা জানার ও বোঝার চেষ্টা করব।

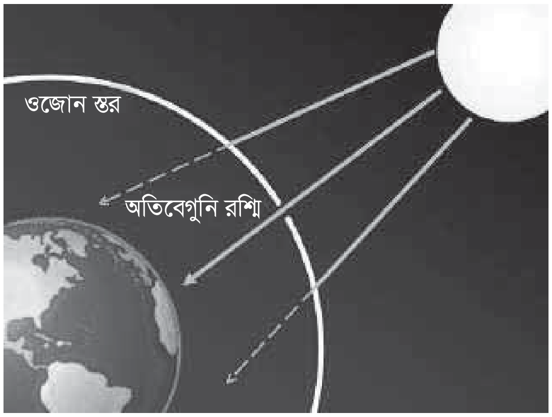

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- বায়ুর উপাদান বর্ণনা করতে পারব।
- বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস ও তাদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান বর্ণনা করতে পারব।
- জলবায়ুর নিয়ামক বর্ণনা করতে পারব।
- বায়ুপ্রবাহ ও তার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- পানিচক্র ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকারের বৃষ্টিপাত সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সম্ভাব্য যে প্রভাব পড়বে তা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের মানুষের বাসস্থান, জীবন-জীবিকা ও পরিবেশের উপর সম্ভাব্য প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।

বায়ুর উপাদান (Composition of the Atmosphere)

জীবন ধারণের জন্য পৃথিবীর জীবকুলের কাছে যেসব জিনিস অপরিহার্য বায়ুমন্ডল তাদের মধ্যে অন্যতম। যে গ্যাসীয় আবরণ পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে তাকে বলে বায়ুমন্ডল। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ফলে বায়ুমন্ডলও ভূপৃষ্ঠের চারদিকে জড়িয়ে থেকে অনবরত আবর্তন করছে। বায়ুমন্ডলের বর্ণ, গন্ধ, আকার কিছুই নেই। তাই একে খালি চোখে দেখা যায় না, কেবল অনুভব করা যায়। বায়ুমন্ডলের বিশালতা এবং এর ক্রিয়াদি সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের গবেষণা নিরন্তর চলছে। বিভিন্ন উপগ্রহ ও গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে, ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে প্রায় ১০,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুমন্ডল বিস্তৃত। বায়ুমন্ডলের ব্যাপ্তি যত বিশাল হোক না কেন, এর প্রায় ৯৭ ভাগ উপাদানই ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই মানুষ, উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর উপর এর প্রভাব অত্যন্ত বেশি। বায়ুমন্ডল প্রধানত তিন প্রকার উপাদান দ্বারা গঠিত। যেমন– বিভিন্ন প্রকার গ্যাস, জলীয়বাষ্প এবং ধূলিকণা ও কণিকা (সারণি ১)।

সারণি ১ : বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন উপাদানের তালিকা

উপাদানের নাম	শতকরা হার
নাইট্রোজেন (N_2)	৭৮.০২
অক্সিজেন (O_2)	২০.৭১
আরগন (Ar)	০.৮০
কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2)	০.০৩
অন্য গ্যাসসমূহ (নিয়ন, হিলিয়াম, ক্রিপটন, জেনন, ওজোন, মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইড)	০.০২
জলীয়বাষ্প	০.৪১
ধূলিকণা ও কণিকা	০.০১
	মোট ১০০.০০

বায়ুমন্ডল নানাপ্রকার গ্যাস ও বাষ্পের সমন্বয়ে গঠিত হলেও এর প্রধান উপাদান দুটি– নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন। বায়ুমন্ডলে আয়তনের দিক থেকে এ দুটি গ্যাস একত্রে শতকরা ৯৮.৭৩ ভাগ এবং বাকি শতকরা ১.২৭ ভাগ অন্যান্য গ্যাস, জলীয়বাষ্প ও কণিকাসমূহ জায়গা জুড়ে আছে। জীবজগৎ পরস্পর অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের গ্রহণ ও ত্যাগের মাধ্যমে বেঁচে আছে। ওজোন গ্যাসের স্তর সূর্য থেকে আসা অতিবেগুনি রশ্মিকে শোষণ করে জীবজগৎকে রক্ষা করে।

বায়ুমন্ডলের স্তরবিন্যাস ও বৈশিষ্ট্য (Atmospheric layers and its characteristics)

বায়ুমন্ডল যে সমস্ত উপাদানে গঠিত তাদের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও উষ্ণতার পার্থক্য অনুসারে ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে পর্যায়ক্রমে পাঁচটি স্তরে ভাগ করা হয়। যথা– ট্রপোমন্ডল, স্ট্রাটোমন্ডল, মেসোমন্ডল, তাপমন্ডল ও এক্সোমন্ডল (চিত্র ৫.১)। উল্লিখিত স্তরগুলোর প্রথম তিনটি সমমন্ডল (Homosphere) এবং পরবর্তী দুটি বিষমমন্ডল (Hetrosphere)-এর অন্তর্ভুক্ত।

ট্রপোমন্ডল (Troposphere)

এই স্তরটি বায়ুমন্ডলের সবচেয়ে নিচের স্তর, ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে লেগে আছে। মেঘ, বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত, বায়ুপ্রবাহ, ঝড়, তুষারপাত, শিশির, কুয়াশা সবকিছুই এই স্তরে সৃষ্টি হয়। ট্রপোমন্ডলের শেষ প্রান্তের অংশের নাম ট্রপোবিরতি (Tropopause)। এই স্তর ভূপৃষ্ঠ থেকে নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রায় ১৬–১৯ কিলোমিটার এবং মেরু অঞ্চলে প্রায় ৮ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত।

ট্রপোমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Troposphere)

(ক) ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর ঘনত্ব কমতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকে উষ্ণতা। সাধারণভাবে প্রতি ১,০০০ মিটার উচ্চতায় ৬° সেলসিয়াস তাপমাত্রা হ্রাস পায়।

(খ) উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাতাসের গতিবেগ বেড়ে যায়।

(গ) নিচের দিকের বাতাসে জলীয়বাষ্প বেশি থাকে।

(ঘ) ধূলিকণার অবস্থানের ফলে সমগ্র বায়ুমণ্ডলের ওজনের প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ এই স্তর বহন করে।

(ঙ) যে উচ্চতায় তাপমাত্রা বন্ধ হয়ে যায় তাকে ট্রপোবিরতি বলে। এখানে তাপমাত্রা –৫৪° সেলসিয়াসের নিচে হতে পারে।

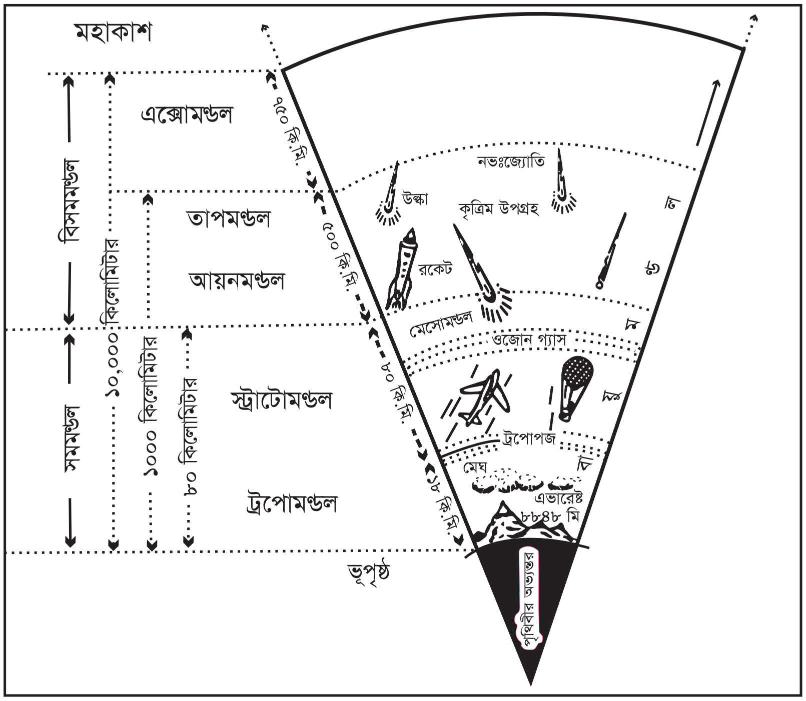

চিত্র ৫.১ : বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস

স্ট্রাটোমণ্ডল (Stratosphere)

ট্রপোবিরতির উপরের দিকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত স্ট্রাটোমণ্ডল নামে পরিচিত। স্ট্রাটোমণ্ডল ও মেসোমণ্ডলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে তাপমাত্রার স্থিতাবস্থাকে স্ট্রাটোবিরতি (Stratopause) বলে।

স্ট্রাটোমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Stratosphere)

(ক) এই স্তরেই ওজোন (O_3) গ্যাসের স্তর বেশি পরিমাণে আছে। এ ওজোন স্তর সূর্যের আলোর বেশিরভাগ অতিবেগুনি রশ্মি (Ultraviolate rays) শুষে নেয়। ধীরে ধীরে তাপমাত্রা ৪° সেলিসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

(খ) এই স্তরের বায়ুতে অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা ছাড়া কোনোরকম জলীয়বাষ্প থাকে না। ফলে আবহাওয়া থাকে শান্ত ও শুষ্ক। ঝড়বৃষ্টি থাকে না বলেই এই স্তরের মধ্য দিয়ে সাধারণত জেট বিমানগুলো চলাচল করে।

(গ) প্রায় ৫০ কিলোমিটার উচ্চতায় তাপমাত্রা পুনরায় হ্রাস পেতে শুরু করে। এটি স্ট্রাটোমণ্ডলের শেষ প্রান্ত নির্ধারণ করে।

মেসোমন্ডল (Mesosphere)

স্ট্রাটোবিরতির উপরে প্রায় ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুস্তরকে মেসোমন্ডল বলে। এই স্তরের উপরে তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়া থেমে যায়। এই স্তরকে মেসোবিরতি (Mesopause) বলে।

মেসোমন্ডলের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Mesosphere)

(ক) এই স্তরে ট্রপোমন্ডলের মতোই উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা কমতে থাকে। যা –৮৩° সেলসিয়াস পর্যন্ত নিচে নেমে যায়। মেসোমন্ডল বায়ুমন্ডলের সবচেয়ে শীতলতম তাপমাত্রা ধারণ করে।

(খ) মহাকাশ থেকে যেসব উল্কা পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে সেগুলোর অধিকাংশই এই স্তরের মধ্যে এসে পুড়ে যায়।

তাপমন্ডল (Thermosphere)

মেসোবিরতির উপরে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুস্তরকে তাপমন্ডল বলে। এই মন্ডলে বায়ুস্তর অত্যন্ত হালকা ও চাপ ক্ষীণ। তাপমন্ডলের নিম্ন অংশকে আয়নমন্ডল (Ionosphere) বলে।

তাপমন্ডলের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Thermosphere)

(ক) এই স্তরে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা অত্যন্ত দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৮০° সেলসিয়াসে পৌঁছায়।

(খ) তাপমন্ডলের উপরের স্তরে তাপমাত্রার পরিমাণ প্রায় স্থির থাকে।

(গ) তীব্র সৌর বিকিরণে রঞ্জন রশ্মি ও অতিবেগুনি রশ্মির সংঘাতে এই অংশের বায়ু আয়নযুক্ত হয়।

(ঘ) ভূপৃষ্ঠ থেকে পাঠানো বিভিন্ন বেতারতরঙ্গ আয়নমন্ডলের বিভিন্ন আয়নে বাধা পেয়ে পুনরায় ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে।

এক্সোমন্ডল (Exosphere)

তাপমন্ডলের উপরে প্রায় ৯৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত যে বায়ুস্তর আছে তাকে এক্সোমন্ডল বলে। এই স্তরে হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রাধান্য দেখা যায়।

এক্সোমন্ডলের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Exosphere)

(ক) এক্সোমন্ডল, তাপমন্ডল অতিক্রম করে ৯৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এটি ক্রমান্বয়ে ইন্টারপ্লানেটারি স্পেস এ প্রবেশ করে।

(খ) এ স্তরের তাপমাত্রা প্রায় ৩০০° সেলসিয়াস থেকে ১৬৫০° সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়।

(গ) এ স্তরে খুব সামান্য পরিমাণ গ্যাস যেমন– অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, আর্গন এবং হিলিয়াম ধারণ করে, কেননা মাধ্যাকর্ষণের ঘাটতির কারণে গ্যাস অণু বা কণাগুলো সহজে মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে।

কাজ : নিচের ছকটিতে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলো দলে কাজ করে লেখ।

ট্রপোমণ্ডল	স্ট্রাটোমণ্ডল	মেসোমণ্ডল	তাপমণ্ডল	এক্সোমণ্ডল

বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন স্তরের গুরুত্ব (Importance of Difference Layers of Atmosphere)

- বায়ুমন্ডল ছাড়া যেমন কোনো শব্দতরঙ্গ স্থানান্তরিত হয় না, তেমনি ভূপৃষ্ঠ থেকে পাঠানো বেতারতরঙ্গ আয়নস্তরে বাধা পেয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে।
- ট্রপোমন্ডল ছাড়া কোনো আবহাওয়ারও সৃষ্টি হতো না; বরফ জমত না; মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াশা, শিশির, তুষার, শিলাবৃষ্টি ইত্যাদির সৃষ্টি হতো না। শস্য ও বনভূমির জন্য প্রয়োজনীয় বৃষ্টি হতো না।
- পৃথিবীতে বায়ুমন্ডলীয় স্তর থাকায় এর দিকে আগত উল্কাপিন্ড অধিক পরিমাণে বিধ্বস্ত হয়। ওজোন স্তর না থাকলে সূর্য থেকে মারাত্মক অতিবেগুনি রশ্মি বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করে প্রাণিকুল বিনষ্ট করত।
- বায়ুমন্ডলের স্তরসমূহ না থাকলে পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্ব থাকত না, বরং পৃথিবীর উপরিভাগ চাঁদের মতো মরুময় হতো।

আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান (Elements of Weather and Climate)

আমরা পত্রিকা, বেতার, টেলিভিশন ও ইন্টারনেট থেকে প্রতিদিন আবহাওয়ার সংবাদ সংগ্রহ করে থাকি। আবহাওয়া মানুষের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে প্রভাব বিস্তার করে। বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশের আবহাওয়া অফিস এ সংক্রান্ত উপাত্ত ও তথ্য প্রচার মাধ্যমে প্রতিদিন সরবরাহ করছে। আবহাওয়া অফিসগুলোতে দিনের পর দিন আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদান পর্যবেক্ষণ করে জলবায়ু সম্পর্কে ধারণা করা হয়। যে কোনো স্থানের আবহাওয়ার উপাদানগুলো নিত্য পরিবর্তনশীল। আবার পৃথিবীর সব স্থানের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য একরকম নয়।

কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানের বায়ুর তাপ, চাপ, আর্দ্রতা, মেঘাচ্ছন্নতা, বৃষ্টিপাত ও বায়ুপ্রবাহের দৈনন্দিন সামগ্রিক অবস্থাকে সেই দিনের আবহাওয়া বলে। কোনো একটি অঞ্চলের সাধারণত ৩০–৪০ বছরের গড় আবহাওয়ার অবস্থাকে জলবায়ু বলে। কাজেই জলবায়ু হলো কোনো একটি অঞ্চলের অনেক দিনের বায়ুমন্ডলের নিম্নস্তরের সামগ্রিক অবস্থা।

আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদানগুলো হলো বায়ুর তাপ, বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহ, বায়ুর আর্দ্রতা ও বারিপাত।

জলবায়ুর নিয়ামক (Factors of Climate)

পৃথিবীর সব অঞ্চলের জলবায়ু একই রকম নয়। এর কোনো অঞ্চল উষ্ণ এবং কোনো অঞ্চল শীতল। আবার কোনো স্থান বৃষ্টিবহুল এবং কোনো স্থান বৃষ্টিহীন। কিছু ভৌগোলিক বিষয়ের পার্থক্যের কারণে স্থানভেদে জলবায়ুর এরকম পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই বিষয়গুলোকে জলবায়ুর নিয়ামক বলে। বিভিন্ন নিয়ামকের বিবরণ ও জলবায়ুর উপাদানের উপর তাদের প্রভাব বর্ণনা করা হলো :

১। অক্ষাংশ (Latitude) : সূর্যকিরণের মাত্রা অক্ষাংশভেদে বিভিন্ন রকম হয়। নিরক্ষরেখার উপর সারাবছর সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়। আর নিরক্ষরেখা থেকে যতই উত্তর বা দক্ষিণে যাওয়া যায়, সূর্যকিরণ তির্যকভাবে পড়তে থাকে। এর ফলে নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর ও দক্ষিণ উভয় মেরুর দিকে তাপমাত্রা ক্রমশ কমতে থাকে।

২। উচ্চতা (Altitude) : সমুদ্র সমতল থেকে যতই উপরে ওঠা যায়, উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমন্ডলীয় তাপমাত্রা ততই হ্রাস পায়। সাধারণত প্রতি ১,০০০ মিটার উচ্চতায় প্রায় ৬° সেলসিয়াস তাপমাত্রা হ্রাস পায়। এ উচ্চতার পার্থক্যের কারণে দুই জায়গা একই অক্ষাংশে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও একটি অপরটির চেয়ে ভিন্ন জলবায়ু সম্পন্ন হয়। যেমন– দিনাজপুর ও শিলং একই অক্ষাংশে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও শুধু উচ্চতার তারতম্যের জন্য এদের জলবায়ু ভিন্ন রকম। উচ্চতা বেশি হওয়াতে শিলং-এ দিনাজপুরের চেয়ে তাপমাত্রা কম হয়।

৩। সমুদ্র থেকে দূরত্ব (Distance from the sea) : জলভাগের অবস্থান কোনো এলাকার জলবায়ুকে মৃদুভাবাপন্ন করে। যেমন– কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, পটুয়াখালী সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত হওয়ার কারণে এখানকার জলবায়ু রাজশাহীর তুলনায় বেশ মৃদুভাবাপন্ন। সমুদ্র নিকটবর্তী এলাকার তাপমাত্রায় শীত-গ্রীষ্ম তেমন পার্থক্য হয় না। এ ধরনের জলবায়ুকে সমভাবাপন্ন জলবায়ু বলে। কিন্তু সমুদ্র উপকূল থেকে দূরের এলাকায় শীত-গ্রীষ্ম উভয়ই চরম হয়। কারণ স্থলভাগ জলভাগ অপেক্ষা যেমন দ্রুত উষ্ণ হয়, আবার দ্রুত ঠান্ডাও হয়। এজন্য গ্রীষ্মকালে মহাদেশের অভ্যন্তরভাগের এলাকা অত্যন্ত উত্তপ্ত থাকে, আবার শীতকালে প্রচন্ড শীত অনুভূত হয়। এ ধরনের জলবায়ুকে মহাদেশীয় বা চরমভাবাপন্ন জলবায়ু বলে।

৪। বায়ুপ্রবাহ (Wind movement) : বায়ুপ্রবাহ কোনো এলাকার জলবায়ুর উপরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু কোনো এলাকার উপর দিয়ে প্রবাহিত হলে সে এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। যেমন– বাংলাদেশে বর্ষাকালে প্রচুর জলীয়বাষ্পপূর্ণ মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। আবার শীতকালে বাংলাদেশের উপর দিয়ে শুষ্ক মহাদেশীয় বায়ু প্রবাহিত হওয়ার কারণে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে।

৫। সমুদ্রস্রোত (Ocean currents) : শীতল বা উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের প্রভাবে উপকূল সংলগ্ন এলাকার বায়ু ঠান্ডা বা উষ্ণ হয়। যেমন– উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলবর্তী এলাকার উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। আবার শীতল ল্যাব্রাডর স্রোত উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলকে শীতল রাখে।

৬। পর্বতের অবস্থান (Location of the mountains) : উচ্চ পার্বত্যময় এলাকা বায়ুপ্রবাহের পথে বাধা হলে এর প্রভাব জলবায়ুর উপর পরিলক্ষিত হয়। যেমন– মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের উত্তরে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত হিমালয় পর্বতে বাধা পাওয়ায় বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। অপরদিকে শীতকালে মধ্য এশিয়ার শীতল বায়ু হিমালয় অতিক্রম করতে পারে না। তাই ভারতীয় উপমহাদেশের জলবায়ু ইউরোপের মতো তত শীতল হয় না।

৭। ভূমির ঢাল (Slope of the land) : সূর্যকিরণ উঁচুভূমির ঢাল বরাবর লম্বভাবে পতিত হলে সেখানকার বায়ু এবং ভূমি বেশি উত্তপ্ত হয়। কিন্তু ঢালের বিপরীত দিকে সূর্যকিরণ কিছুটা তির্যকভাবে পড়ে বা কখনো সূর্যালোক খুব কম পায় ফলে বায়ু শীতল হয়।

৮। মৃত্তিকার গঠন (Composition of the soil) : মৃত্তিকার গঠন বা বুনট সূর্যতাপ সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। প্রস্তর বা বালুকাময় মৃত্তিকার তাপ সংরক্ষণ ক্ষমতা কম। এজন্য তা দ্রুত উত্তপ্ত এবং দ্রুত শীতল হয়। যেমন– মরুভূমিতে দিনে প্রচন্ড গরম এবং রাতে প্রচন্ড ঠান্ডা।

৯। বনভূমির অবস্থান (Location of the forest) : গাছপালা থেকে প্রস্বেদন (Transpiration) ও বাষ্পীভবনের (Evaporation) সাহায্যে বায়ু জলীয়বাষ্পপূর্ণ এবং ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। তাছাড়া বনভূমি ঝড়-তুফান, সাইক্লোনের গতিপথে বাধা দিয়ে এর শক্তি কমিয়ে দেয়। বনভূমিতে সূর্যালোক মাটিতে পৌঁছতে পারে না, ফলে সেখানকার বায়ু তুলনামূলকভাবে শীতল হয়।

কাজ : বাংলাদেশের জলবায়ুর ক্ষেত্রে কোন কোন নিয়ামকসমূহ কীভাবে প্রভাব রাখছে? তা দলে মাথা খাটিয়ে (Brain storming) ব্যাখ্যা কর। প্রত্যেক দল ১৫ মিনিট কাজ করবে এবং দলে কাজ সম্পাদন শেষে সমগ্র দল শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপনের জন্য ১০ মিনিট সময় পাবে।

পানিচক্র (The Water Cycle)

সাধারণভাবে পানি কোথাও স্থির অবস্থায় নেই, বিভিন্নভাবে সর্বদা আবর্তিত হচ্ছে এবং অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। কারণ পানি বাষ্পীয়, তরল ও কঠিন এ তিন অবস্থায় থাকতে পারে। সমগ্র বিশ্বের পানি সরবরাহের সর্ববৃহৎ ও স্থায়ী আধার হচ্ছে সমুদ্র। বাষ্পীভবনের মাধ্যমে সমুদ্রের পানি উত্তপ্ত ও হালকা হয়ে বাষ্পাকারে উপরে ওঠে এবং সুবিশাল বায়ুমন্ডলে মিশে যায়। এছাড়া ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ থেকে প্রস্বেদনের মাধ্যমে জলীয় অংশ বায়ুমন্ডলে সম্পৃক্ত হয়। জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু শীতল ও ঘনীভূত হয়ে মেঘ, বৃষ্টি, শিশির, কুয়াশা, তুষার, বরফ প্রভৃতিতে পরিণত হয়ে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। বিভিন্ন উপায়ে ভূপৃষ্ঠে পতিত পানির কিছু অংশ বাষ্পীভবনের মাধ্যমে পুনরায় বায়ুমন্ডলে মিশে যায়, কিছু অংশ নদী দ্বারা বাহিত হয়ে (Run off) সমুদ্রে পতিত হয়, কিছু অংশ উদ্ভিদ অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় (Osmosis) গ্রহণ করে এবং অবশিষ্টাংশ ভূপৃষ্ঠের শিলাস্তরের মধ্যে চুয়ে (Percolation) প্রবেশ করে। এভাবেই প্রকৃতিতে পানিচক্র চলতে থাকে (চিত্র ৫.২)।

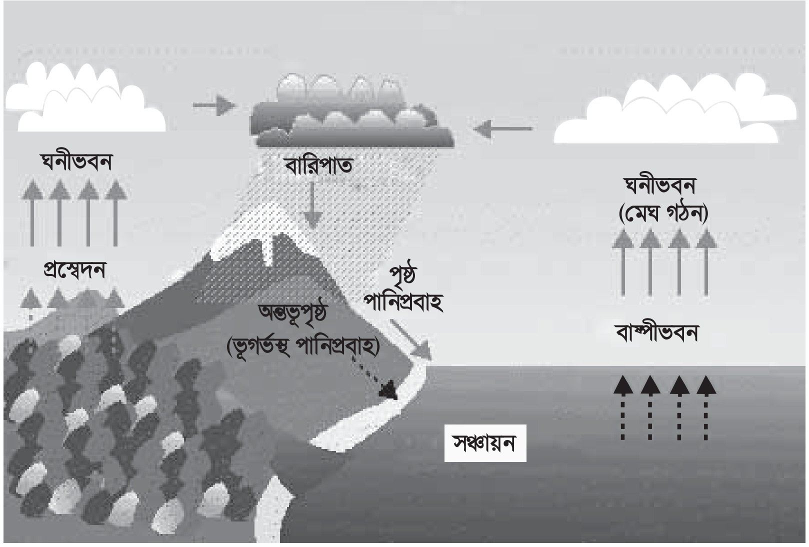

চিত্র ৫.২ : পানিচক্র

পানিচক্রের প্রক্রিয়াগুলোর বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো :

১। বাষ্পীভবন (Evaporation) : সূর্যের তাপে সমুদ্র, নদী, হ্রদ প্রভৃতি থেকে পানি ক্রমাগত বাষ্পে পরিণত হচ্ছে এবং তা অপেক্ষাকৃত হালকা বলে উপরে উঠে বায়ুমন্ডলে মিশে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। একে বাষ্পীভবন বলে। বায়ুর বাষ্প ধারণ করার একটা সীমা আছে। তা বায়ুর উষ্ণতার উপর নির্ভর করে। বায়ু যত উষ্ণ হয়, তত বেশি জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে। সমুদ্রই জলীয়বাষ্পের প্রধান উৎস। উদ্ভিদজগৎ, নদ-নদী এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় থেকেও বায়ু জলীয়বাষ্প সংগ্রহ করে থাকে।

২। ঘনীভবন (Condensation) : পরিপৃক্ত বায়ু উষ্ণতর হলে তখন এটি আরও বেশি জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে। আবার বায়ু শীতল হতে থাকলে পূর্বের মতো বেশি জলীয়বাষ্প ধারণ করে রাখতে পারে না, তখন জলীয়বাষ্পের কিছু অংশ পানিতে পরিণত হয়, তাকে ঘনীভবন বলে।

বায়ু নির্দিষ্ট পরিমাণ জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে। কিন্তু বায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার জলীয়বাষ্প ধারণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কোনো নির্দিষ্ট উষ্ণতায় বায়ু যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে, সেই পরিমাণ জলীয়বাষ্প বায়ুতে থাকলে বায়ু আর অধিক জলীয়বাষ্প গ্রহণ করতে পারে না। তখন তাকে সম্পৃক্ত বা পরিপৃক্ত বায়ু (Saturated air) বলে।

বায়ু যে উষ্ণতায় (জলীয়বাষ্পরূপে) ঘনীভূত হয় তাকে শিশিরাঙ্ক (Dew point) বলে। তাপমাত্রা ০° সেলসিয়াস বা হিমাঙ্কের (Freezing point) নিচে নেমে গেলে তখন ঘনীভূত জলীয়বাষ্প কঠিন আকার ধারণ করে এবং তুষার ও বরফরূপে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। কিন্তু হিমাঙ্ক শিশিরাঙ্কের উপরে থাকলে ঘনীভবনের মাধ্যমে শিশির, কুয়াশা অথবা বৃষ্টিতে পরিণত হয়।

বায়ুর আর্দ্রতা (Humidity) : জলীয়বাষ্প বায়ুর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণ করাকে বায়ুর আর্দ্রতা বলে। বায়ুমন্ডলে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ শতকরা ১ ভাগেরও কম। বায়ুতে জলীয়বাষ্প যখন একদম থাকে না, তাকে শুষ্ক বায়ু বলে। যে বায়ুতে জলীয়বাষ্প বেশি থাকে, তাকে আর্দ্র বায়ু বলে। আর্দ্র বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ থাকে প্রায় শতকরা ২ থেকে ৫ ভাগ। বায়ুর আর্দ্রতা হাইগ্রোমিটার (Hygrometer) দ্বারা পরিমাপ করা হয়। বায়ুর আর্দ্রতা দুভাবে প্রকাশ করা যায়। যথা– পরম আর্দ্রতা (Absolute humidity) ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা (Relative humidity)।

কোনো নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে জলীয়বাষ্পের প্রকৃত পরিমাণকে পরম আর্দ্রতা বলে। অপরদিকে, কোনো নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে জলীয়বাষ্পের প্রকৃত পরিমাণ আর একই আয়তনের বায়ুকে একই উষ্ণতায় পরিপৃক্ত করতে যে পরিমাণ জলীয়বাষ্পের প্রয়োজন এ দুটির অনুপাতকে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বলে।

৩। **বারিপাত (Precipitation) :** জলীয়বাষ্প উপরে উঠে শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এসে ঘনীভূত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা ও তুষারকণায় পরিণত হয়ে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। একে বারিপাত বলে। সকল প্রকার বারিপাত এই জলীয়বাষ্পের উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতি অনুযায়ী বারিপাত বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা– তুষার, তুহিন, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি।

শিশির (Dew) : ভূপৃষ্ঠ তাপ বিকিরণের মাধ্যমে রাতে শীতল হয়। এ সময় ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুস্তরের তাপমাত্রা হ্রাস পায়। ফলে বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণ ক্ষমতা কমে যায় এবং অতিরিক্ত জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে ক্ষুদ্র জলবিন্দুরূপে ভূপৃষ্ঠে সঞ্চিত হয়। এটাই শিশির নামে পরিচিত।

কুয়াশা (Fog) : কখনো কখনো বায়ুমন্ডলের ভাসমান ধূলিকণাকে আশ্রয় করে জলীয়বাষ্প রাত্রিবেলায় অল্প ঘনীভূত হয়ে ধোঁয়ার আকারে ভূপৃষ্ঠের কিছু উপরে ভাসতে থাকে। একে কুয়াশা বলে।

তুষারপাত (Snow fall) : শীতপ্রধান এলাকায় তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে নামলে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে পেঁজা তুষার ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। একে তুষারপাত বলে।

৪। **পানিপ্রবাহ (Run off) :** বারিপাতের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠে আগত পৃষ্ঠপ্রবাহ পানিরূপে নদী, হ্রদ, সমুদ্রে পতিত হয়। আবার ভূঅভ্যন্তরে প্রবেশ করে অন্তঃপ্রবাহরূপে নদী ও সমুদ্রে জমা হয়। পানির কিছু অংশ ভূগর্ভে জমা হয়। পানিপ্রবাহকে আবার কতকগুলো ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) পৃষ্ঠপ্রবাহ (Surface flow)
(খ) অন্তঃপ্রবাহ (Subsurface flow)
(গ) চুয়ানো (Percolation)
(ঘ) পরিস্রবণ (Infiltration)

ভূঅভ্যন্তরস্থ পানি পুনরায় প্রস্বেদন, বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় বায়ুতে ফিরে আসে।

কাজ : নিচের শব্দগুলো দিয়ে কী বোঝায়? তা দলে আলোচনা করে ছকে উল্লেখ কর।			
বাষ্পীভবন	**ঘনীভবন**	**বারিপাত**	**পৃষ্ঠপ্রবাহ**

বৃষ্টিপাত (Rainfall)

স্বাভাবিকভাবে ভাসমান মেঘ ঘনীভূত হয়ে পানির ফোঁটা ফোঁটা আকারে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে ভূপৃষ্ঠে পতিত হলে তাকে বৃষ্টিপাত বলে। এই বৃষ্টিপাত কখনো প্রবল এবং কখনো গুঁড়ি গুঁড়ি আকারে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। বৃষ্টিপাত বৃষ্টিমাপক যন্ত্রের (Rain gauge) দ্বারা পরিমাপ করা হয়।

বৃষ্টিপাতের কারণ (Causes of Raifall) : সূর্যের উত্তাপে সৃষ্ট জলীয়বাষ্প উপরের শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এলে সহজেই তা পরিপৃক্ত হয়। পরে ঐ পরিপৃক্ত বায়ু অতি ক্ষুদ্র জলকণায় পরিণত হয়ে বায়ুমন্ডলের ধূলিকণাকে আশ্রয় করে জমাট বেঁধে মেঘের আকারে আকাশে ভাসতে থাকে। বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা কোনো কারণে আরও হ্রাস পেলে ঐ মেঘ ঘনীভূত হয়ে পানিবিন্দুতে অথবা বরফকুচিতে পরিণত হয় এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে তা ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে। এভাবে পৃথিবীতে বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। সুতরাং বৃষ্টিপাতের কারণ হলো– (১) বাতাসে জলীয়বাষ্পের উপস্থিতি, (২) ঊর্ধ্ব গমন এবং (৩) বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা হ্রাস পাওয়া।

বৃষ্টিপাতের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Rainfall) : জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু যে কারণে উপরে উঠে ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাতে পরিণত হয়। সেই অনুসারে বৃষ্টিপাতের শ্রেণিবিভাজন করা হয়ে থাকে। বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি অনুসারে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতকে প্রধানত চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা– (১) পরিচলন বৃষ্টি, (২) শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি, (৩) বায়ুপ্রাচীরজনিত বৃষ্টি ও (৪) ঘূর্ণি বৃষ্টি।

(১) পরিচলন বৃষ্টি (Convectional Rain) : দিনের বেলায় সূর্যের কিরণে পানি বাষ্পে পরিণত হয়ে সোজা উপরে উঠে যায় এবং শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এসে ঐ জলীয়বাষ্প প্রথমে মেঘ ও পরে বৃষ্টিতে পরিণত হয়ে সোজাসুজি নিচে নেমে আসে। এরূপ বৃষ্টিপাতকে পরিচলন বৃষ্টি বলে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে (Equatorial region) স্থলভাগের চেয়ে জলভাগের বিস্তৃতি বেশি এবং এখানে সূর্যকিরণ সারাবছর লম্বভাবে পড়ে। এ দুটি কারণে এখানকার বায়ুমন্ডলে সারাবছর জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকে। জলীয়বাষ্প হালকা বলে সহজেই তা উপরে উঠে গিয়ে শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এসে পরিচলন বৃষ্টিরূপে ঝরে পড়ে। তাই নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারাবছর প্রতিদিনই বিকেল অথবা সন্ধ্যার সময় এরূপ বৃষ্টিপাত হয়। নাতিশীতোষ্ণমন্ডলে গ্রীষ্মকালের শুরুতে পরিচলন বৃষ্টি হয়ে থাকে। এ সময়ে এই অঞ্চলের ভূপৃষ্ঠ যথেষ্ট উত্তপ্ত হলেও উপরের বায়ুমন্ডল বেশ শীতল থাকে। ফলে ভূপৃষ্ঠের জলাশয়গুলো থেকে পানি বাষ্পে পরিণত হয়ে সোজা উপরে উঠে যায় এবং শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এসে পরিচলন বৃষ্টিরূপে পতিত হয় (চিত্র ৫.৩)।

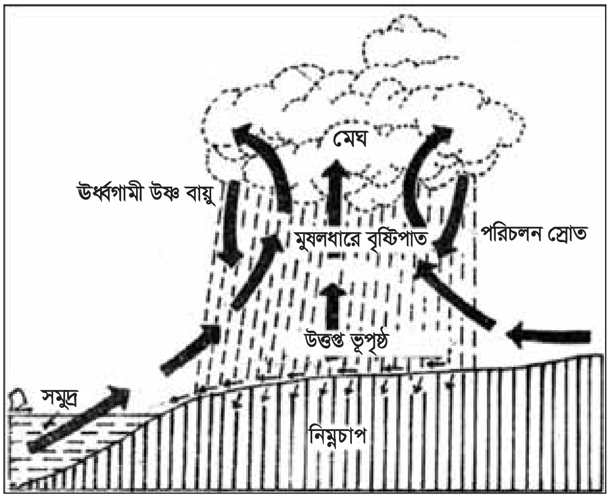

চিত্র ৫.৩ : পরিচলন বৃষ্টি

পরিচলন বৃষ্টি নিম্নলিখিত পর্যায় অনুসরণ করে ঘটে থাকে :

- প্রচন্ড সূর্যকিরণে ভূপৃষ্ঠ দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।
- ভূপৃষ্ঠের উপরস্থ বায়ু উষ্ণ এবং হালকা হয়ে উপরের দিকে উঠে পরিচলনের সৃষ্টি করে।
- ঊর্ধ্বমুখী বায়ু শুষ্ক রুদ্ধ তাপ হ্রাস হারে শীতল হতে থাকে এবং বায়ুতে যথেষ্ট পরিমাণ জলীয়বাষ্পের উপস্থিতিতে ঘনীভবন হয়।
- ঘনীভবনের ফলে মেঘ উপরের দিকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে ঝড়োপুঞ্জ মেঘের সৃষ্টি করে। এ ধরনের মেঘ থেকে ঝড়সহ মুষলধারে বৃষ্টি এবং কখনো কখনো শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাত হয়ে থাকে।

(২) শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি (Orographic Rain) : জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু স্থলভাগের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় যদি গমনপথে কোনো উঁচু পর্বতশ্রেণিতে বাধা পায় তাহলে ঐ বায়ু উপরের দিকে উঠে যায়। তখন জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু ক্রমশ প্রসারিত হয় এবং পর্বতের উঁচু অংশে শীতল ও ঘনীভূত হয়ে পর্বতের প্রতিবাত ঢালে (Windward slope) বৃষ্টিপাত ঘটায়। এরূপ বৃষ্টিপাতকে শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি বলে (চিত্র ৫.৪)।

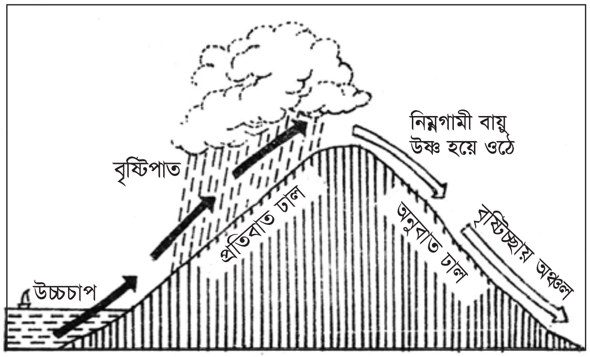

চিত্র ৫.৪ : শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি

পর্বত অতিক্রম করে ঐ বায়ু যখন পর্বতের অপর পার্শ্বে অর্থাৎ অনুবাত ঢালে (Leeward slope) এসে পৌঁছায় তখন জলীয়বাষ্প কমে যায়। এছাড়া নিচে নামার ফলে ঐ বায়ু উষ্ণ ও আরও শুষ্ক হয়। এ দুটো কারণে এখানে বৃষ্টি বিশেষ হয় না। এরূপ প্রায় বৃষ্টিহীন স্থানকে বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল (Rain-shadow region) বলে।

> জলীয়বাষ্পপূর্ণ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু হিমালয় পর্বতে বাধা পেয়ে আসাতে প্রচুর শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত ঘটায়। কিন্তু তার উত্তর দিকে অবস্থিত তিব্বতের মালভূমিকে বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল বলে। যেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশ কম।

(৩) বায়ুপ্রাচীরজনিত বৃষ্টি (Frontal Rain) : শীতল ও উষ্ণ বায়ু মুখোমুখি উপস্থিত হলে উষ্ণ বায়ু এবং শীতল বায়ু একে অপরের সঙ্গে মিশে না গিয়ে তাদের মধ্যবর্তী এলাকায় অদৃশ্য বায়ুপ্রাচীরের (Front) সৃষ্টি করে। বায়ুপ্রাচীর সংলগ্ন এলাকায় শীতল বায়ুর সংস্পর্শে উষ্ণ বায়ুর তাপমাত্রা হ্রাস পায় ফলে শিশিরাঙ্কের সৃষ্টি হয়। ফলে উভয় বায়ুর সংযোগস্থলে বৃষ্টিপাত ঘটে, একে বায়ুপ্রাচীরজনিত বৃষ্টি বলে (চিত্র ৫.৫)। এ প্রকার বৃষ্টিপাত সাধারণত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে দেখা যায়।

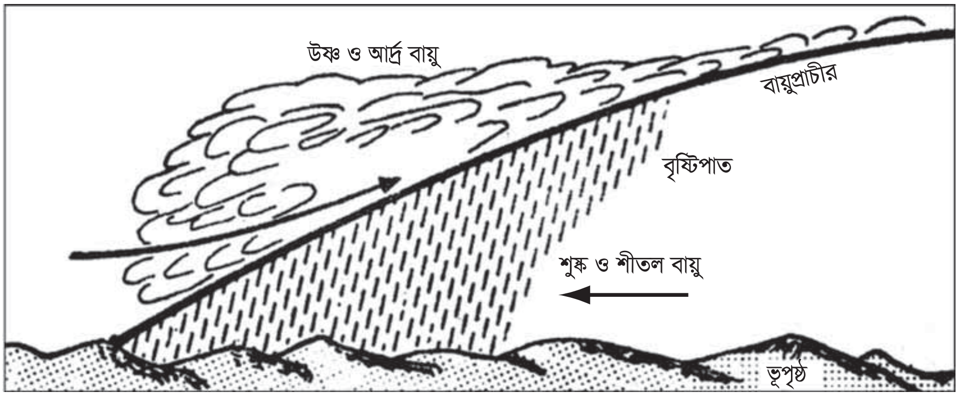

চিত্র ৫.৫ : বায়ুপ্রাচীরজনিত বৃষ্টি

(৪) ঘূর্ণি বৃষ্টি (Cyclonic Rain) : কোনো অঞ্চলে বায়ুমন্ডলে নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হলে জলভাগের উপর থেকে জলীয়বাষ্পপূর্ণ উষ্ণ এবং স্থলভাগের উপর থেকে শুষ্ক শীতল বায়ু ঐ একই নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে অনুভূমিকভাবে ছুটে আসে। শীতল বায়ু ভারী বলে উষ্ণ বায়ু শীতল বায়ুর উপর ধীরে ধীরে উঠতে থাকে। জলভাগের উপর থেকে আসা উষ্ণ বায়ুতে প্রচুর জলীয়বাষ্প থাকে। ঐ বায়ু শীতল বায়ুর উপরে উঠলে তার ভিতরে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত

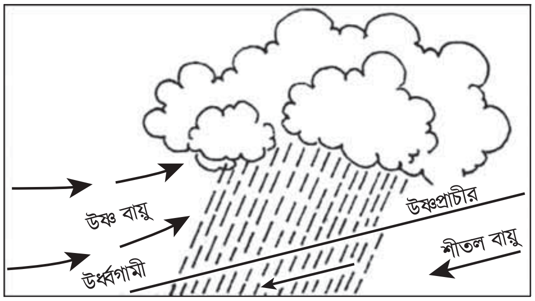

চিত্র ৫.৬ : ঘূর্ণি বৃষ্টি

ঘটায়। এরূপ বৃষ্টিপাতকে ঘূর্ণি বৃষ্টি বলে (চিত্র ৫.৬)। এই বৃষ্টিপাত সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। মধ্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শীতকালে এরূপ বৃষ্টিপাত হতে দেখা যায়।

কাজ : বাংলাদেশে কী কী ধরনের বৃষ্টিপাত হয় এবং কেন হয়? তা ব্যাখ্যা কর। এ কাজটি শ্রেণিকক্ষে দলে আলোচনা করে সম্পাদন কর।

বায়ুপ্রবাহ (Wind Movement)

বায়ুর তাপ ও চাপের পার্থক্যের জন্য বায়ু সর্বদা একস্থান থেকে অন্যস্থানে প্রবাহিত হয়। ভূপৃষ্ঠের সমান্তরাল বায়ু চলাচলকে বায়ুপ্রবাহ বলে। বায়ুপ্রবাহ সাধারণত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়।

১। নিম্নচাপমণ্ডলের উত্তপ্ত ও হালকা বায়ু ঊর্ধ্বে উত্থিত হলে বায়ুমণ্ডলে চাপের অসমতা সৃষ্টি হয়। এ কারণে উচ্চচাপমণ্ডল থেকে শীতল ও ভারী বায়ু সর্বদা নিম্নচাপমণ্ডলের দিকে প্রবাহিত হয়।

চাপ বলয় (Pressure Belts) : ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অক্ষাংশের তাপের পার্থক্য এবং গোলাকার পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে বায়ুমণ্ডলে কয়েকটি চাপমণ্ডলের সৃষ্টি হয় : (১) নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়, (২) ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয়, (৩) উপ-মেরুবৃত্তের নিম্নচাপ বলয়, (৪) মেরু অঞ্চলের উচ্চচাপ বলয়।

২। পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তনশীল এবং নিরক্ষরেখা থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে আবর্তনের কারণে গতিবেগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। এ উভয় কারণে ঘূর্ণায়মান পৃথিবীপৃষ্ঠে গতিশীল পদার্থ (যেমন– বায়ুপ্রবাহ ও জলস্রোত) সরাসরি উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত না হয়ে উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে যায়। ফেরেলের সূত্র (Ferrel's Law) অনুসারে ভূপৃষ্ঠে বায়ুপ্রবাহের দিক নিয়ন্ত্রিত হয়।

নিম্নে কয়েকটি বায়ুপ্রবাহ যেমন– নিয়ত বায়ু, সমুদ্র ও স্থলবায়ু, মৌসুমি বায়ুর প্রভাব ব্যাখ্যা করা হলো।

নিয়ত বায়ু (Planetary Winds)

নিয়ত বায়ু পৃথিবীর চাপ বলয়গুলো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে বছরের সকল সময় একই দিকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ু তিন প্রকারের। যথা– অয়ন বায়ু, পশ্চিমা বায়ু ও মেরু বায়ু (চিত্র ৫.৭)।

অয়ন বায়ু (The Trade Winds) : নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় থেকে উষ্ণ ও হালকা বায়ু উপরে উঠে গেলে কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে শীতল ও ভারী বায়ু নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। ফেরেলের সূত্র অনুসারে এ বায়ু উত্তর গোলার্ধে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে থাকে। প্রাচীনকালে পরিচালিত বাণিজ্য জাহাজগুলো এ বায়ুপ্রবাহের দিক অনুসরণে যাতায়াত করত বলে এগুলোকে অয়ন বায়ু বা বাণিজ্য বায়ু বলে। উত্তর গোলার্ধে এটি উত্তর-পূর্ব অয়ন বায়ু এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু নামে পরিচিত। উত্তর-পূর্ব অয়ন বায়ু ঘণ্টায়

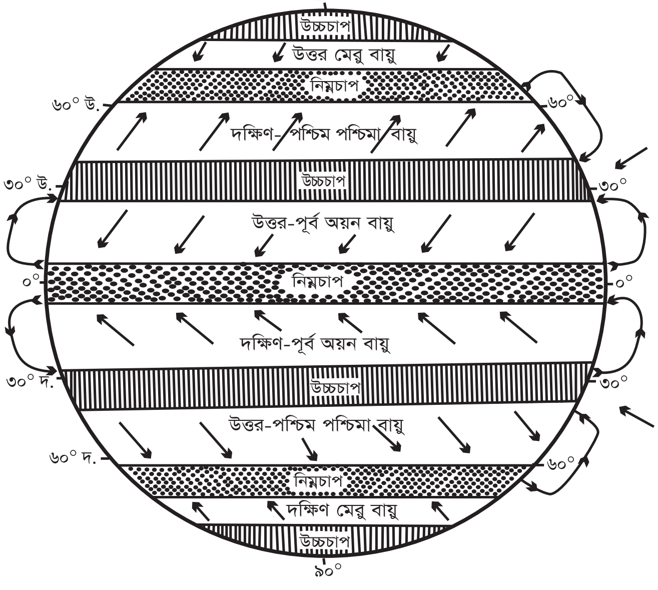

চিত্র ৫.৭ : নিয়ত বায়ু

প্রায় ১৬ কিলোমিটার এবং দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু প্রায় ২২.৫৪ কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত হয়। উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী হলে অত্যধিক তাপে উষ্ণ ও হালকা হয়ে উর্ধ্বে উঠে যায়। তখন নিরক্ষীয় অঞ্চলে বায়ুর অনুভূমিক প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় এবং নিরক্ষরেখার উভয়দিকে উত্তর-দক্ষিণে ৫° অক্ষাংশ পর্যন্ত একটি শান্ত বলয়ের সৃষ্টি হয়। এ বলয়কে নিরক্ষীয় শান্ত বলয় (Doldrum) বলে।

পশ্চিমা বায়ু (The Westerlies) : কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে অয়ন বায়ু ব্যতীত আরও দুটি বায়ুপ্রবাহ মেরুবৃত্ত নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়। উত্তর গোলার্ধে এটি দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়। এ বায়ুপ্রবাহকে পশ্চিমা বায়ু বলে। উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগের পরিমাণ অধিক বলে স্থানীয় কারণে পশ্চিমা বায়ুর সাময়িক বিরতি ঘটে। কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধে জলভাগের পরিমাণ বেশি বলে পশ্চিমা বায়ু প্রবলবেগে এ অঞ্চলে প্রবাহিত হয়। এজন্য এই বায়ুপ্রবাহকে প্রবল পশ্চিমা বায়ু (Brave west winds) বলে। ৪০° থেকে ৪৭° দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত পশ্চিমা বায়ুর গতিবেগ সর্বাপেক্ষা বেশি। এ অঞ্চলকে গর্জনশীল চল্লিশ (Roaring forties) বলে।

নিরক্ষীয় শান্ত বলয়ের ন্যায় ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয়েও দুটি শান্ত বলয়ের সৃষ্টি হয়। ৩০° থেকে ৩৫° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয় দুটি অবস্থিত। বায়ু নিম্নগামী বলে এই অঞ্চলে অনুভূমিক বায়ুপ্রবাহ অনুভব করা যায় না। প্রাচীনকালে যখন আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে জাহাজযোগে ইউরোপ থেকে আমেরিকায় অশ্ব ও অন্যান্য পশু রপ্তানি করা হতো তখন এ অঞ্চলে পৌঁছলে বায়ুপ্রবাহের অভাবে পালচালিত জাহাজের গতি মন্থর বা প্রায় নিশ্চল হয়ে পড়ত। এ অবস্থায় নাবিকগণ খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে অনেক সময় তাদের অশ্বগুলো সমুদ্রে ফেলে দিত। এজন্য আটলান্টিক মহাসাগরের ক্রান্তীয় শান্ত বলয়কে অশ্ব অক্ষাংশ (Horse latitude) বলে। উত্তর গোলার্ধে ৩০° থেকে ৩৫° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত অঞ্চলটিতে শীতকালেও পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয়।

মেরু বায়ু (Polar Winds) : মেরু অঞ্চলের উচ্চচাপ বলয় থেকে অতি শীতল ও ভারী বায়ু উত্তর গেলার্ধে নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়। এ বায়ু উত্তর গোলার্ধে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়। এ প্রবাহদ্বয়কে উত্তর সুমেরু বায়ু ও দক্ষিণ কুমেরু বায়ু বলে।

সমুদ্র ও স্থলবায়ু (Sea and Land Breeze) : দিনের বেলায় স্থলভাগ বেশি উত্তপ্ত হয় বলে সেখানে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়; কিন্তু জলভাগ বেশি উত্তপ্ত হয় না বলে সেখানকার বায়ু উচ্চচাপযুক্ত হয়। ফলে তখন জলভাগ থেকে স্থলভাগের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়। একে সমুদ্রবায়ু বলে (চিত্র ৫.৮)।

আবার রাত্রিকালে জলভাগের চেয়ে স্থলভাগ বেশি শীতল বলে স্থলভাগের বায়ু উচ্চচাপযুক্ত হয়। তখন স্থলভাগ থেকে জলভাগ বা সমুদ্রের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়। একে স্থলবায়ু বলে (চিত্র ৫.৯)। বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থানের কারণে সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ু নিয়মিত প্রবাহিত হয়।

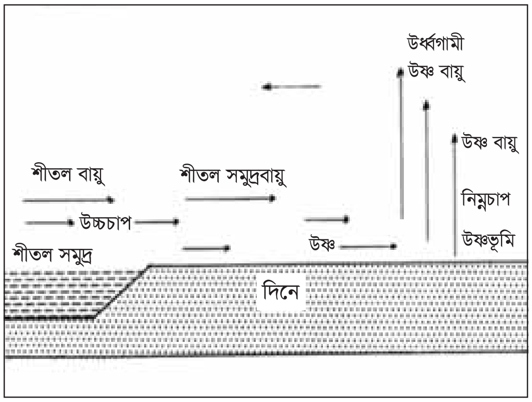

চিত্র ৫.৮ : সমুদ্রবায়ু

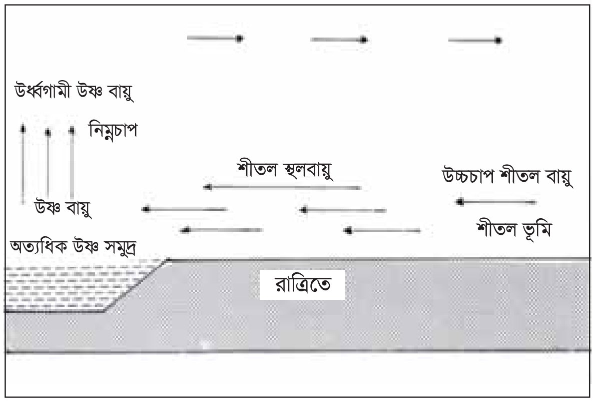

চিত্র ৫.৯ : স্থলবায়ু

মৌসুমি বায়ু (Monsoon Wind) : আরবি ভাষায় 'মওসুম' শব্দের অর্থ ঋতু। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে বায়ুপ্রবাহের দিক পরিবর্তিত হয় তাকে মৌসুমি বায়ু বলে। সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের ফলে শীত-গ্রীষ্মে ঋতুভেদে স্থলভাগ ও জলভাগের তাপের তারতম্য ঘটে। সেজন্য মৌসুমি বায়ুর সৃষ্টি হয়। উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকালে সূর্য কর্কটক্রান্তির উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। এর ফলে কর্কটক্রান্তি অঞ্চলের অন্তর্গত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, উত্তর-পশ্চিম ভারত, মধ্য এশিয়া প্রভৃতি স্থানের স্থলভাগ অতিশয় উত্তপ্ত হয়। ফলে এ সকল অঞ্চলে বায়ুর চাপ কমে যায় এবং একটি সুবৃহৎ নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। এ পরিস্থিতিতে দক্ষিণ গোলার্ধের ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে আগত দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে এশিয়া মহাদেশের নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে প্রবলবেগে ছুটে যায়। এ বায়ুকে উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মের মৌসুমি বায়ু বলে। নিরক্ষরেখা অতিক্রম করলে ফেরেলের সূত্র অনুসারে দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ুর গতি বেঁকে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়। এজন্য গ্রীষ্মের এ বায়ুকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বলে। গ্রীষ্মের মৌসুমি বায়ু সমুদ্রের উপর দিয়ে আসে বলে এতে প্রচুর জলীয়বাষ্প থাকে। এটি আরব সাগরীয় ও বঙ্গোপসাগরীয় এ দুটি শাখায় বিভক্ত হয়। আরব সাগরীয় শাখা পাকিস্তান ও পশ্চিম ভারতে এবং বঙ্গোপসাগরীয় শাখা বাংলাদেশ, মিয়ানমার এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। এছাড়া মধ্য-এশিয়ায় নিম্নচাপের দরুন প্রশান্ত মহাসাগর থেকে জলীয়বাষ্পপূর্ণ দক্ষিণ-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর উৎপত্তি হয়ে কম্বোডিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, চীন ও জাপানে বৃষ্টিপাত ঘটায়।

শীতকালে সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধে মকরক্রান্তির নিকট অবস্থান করায় সেখানে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। এ সময় উত্তর গোলার্ধের স্থলভাগ অত্যন্ত শীতল হওয়ায় সেখানে উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়। ফলে স্থলভাগের উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে বায়ু দক্ষিণের নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হয়। এ বায়ু উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আসে বলে একে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু বলে। স্থলভাগের উপর দিয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে আসে বলে এটা শুষ্ক। মৌসুমি বায়ু নিরক্ষরেখা অতিক্রম করলে ফেরেলের সূত্র অনুসারে দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে যায় এবং উত্তর-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুরূপে উত্তর অস্ট্রেলিয়ার দিকে অগ্রসর হয় এবং বৃষ্টিপাত ঘটায়।

ঋতুর সঙ্গে সঙ্গে দিক পরিবর্তন করে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাকে বলে ঋতু আশ্রয়ী বায়ু। এর মধ্যে রয়েছে মৌসুমি বায়ু। আরও রয়েছে ভূমধ্যসাগরীয় বায়ু।

স্থানীয় বায়ু (Local Wind) : স্থানীয় প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য কিংবা তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে ভূপৃষ্ঠের স্থানে স্থানে স্থানীয় বায়ুর উৎপত্তি হয়। রকি পর্বতের চিনুক (Chinook), ফ্রান্সের কেন্দ্রীয় মালভূমি থেকে প্রবাহিত মিস্ট্রাল (Mistral), আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ের পম্পাস অঞ্চলের উত্তরে পাম্পেরু (Pampero), আড্রিয়াটিক সাগরের পূর্ব উপকূলে বোরা (Bora), উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ ইতালিতে সিরক্কো (Sirocco), আরব মালভূমির সাইমুম (Simoom), মিসরের খামসিন (Khamsin) ও ভারতীয় উপমহাদেশের লু (Loo) কয়েকটি স্থানীয় বায়ুর উদাহরণ।

কাজ : নিম্নের বায়ুসমূহ কোন দিক থেকে কোন দিকে প্রবাহিত হয়? তা নিয়ত বায়ুপ্রবাহ পাঠ করে উল্লেখ কর।

অয়ন বায়ু	পশ্চিমা বায়ু	মেরু বায়ু

বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন (Global warming and climate change)

বিশ্ব উষ্ণায়ন (Global warming) বর্তমান পৃথিবীতে পরিবেশগত প্রধান সমস্যাসমূহের মধ্যে অন্যতম। বিশ্ব উষ্ণায়ন হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে জলবায়ু কখনো এক

থাকেনি। কখনো খুব উষ্ণ ও শুষ্ক থেকেছে। কখনো শীতল হয়ে বরফে ঢেকেছে। কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে অনেক ধীর গতিতে। লক্ষ লক্ষ বছর লেগেছে এবং বলা হয়ে থাকে এই পরিবর্তন হয়েছে কিছু প্রাকৃতিক কারণে (যেমন– পৃথিবীর কক্ষপথ বা পৃথিবীর আবর্তনের পরিবর্তন)। তবে সমকালীন পরিবর্তন নিয়ে সবাই খুব চিন্তিত কারণ এ পরিবর্তন ঘটছে অতি দ্রুত এবং এই পরিবর্তনের একটি বড় কারণ হচ্ছে পৃথিবীপৃষ্ঠে মানুষের ক্রিয়া-কর্ম। একশত বছর পূর্বের গড় তাপমাত্রার তুলনায় প্রায় ০.৬০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজ্ঞানীগণ কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জলবায়ুগত পরিবর্তন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, ২১ শতকের সমাপ্তিকালের মধ্যে গড় তাপমাত্রা প্রায় আরও অতিরিক্ত ২.৫° থেকে ৫.৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রা যুক্ত হতে পারে। এর ফলে পর্বতের উপরিভাগের জমাকৃত বরফ এবং মেরু অঞ্চলের হিমবাহের দ্রুত গলনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে।

চিত্র ৫.১০ : গ্রিনহাউস

বায়ুমন্ডল পৃথিবীর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বড় ভূমিকা পালন করছে। এক্ষেত্রে বায়ুমন্ডল হলো গ্রিনহাউসের বা কাচ ঘরের কাচের দেয়াল বা ছাদের মতো। সূর্যের আলো পৃথিবীর সমস্ত তাপ ও শক্তির মূল উৎস। পৃথিবীতে আসা সূর্যালোক ভূপৃষ্ঠ শোষণ করে ও বায়ুমন্ডল উত্তপ্ত করে। মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ যেমন– কাঠ কয়লা পোড়ানো, গাছ কাটা, কলকারখানার ধোয়া ইত্যাদি কারণে বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন ইত্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এ গ্যাসগুলোকে বলা হয় গ্রিনহাউস গ্যাস। বায়ুমন্ডলে সৃষ্টি হচ্ছে ক্রমশ পুরু একটি (গ্রিনহাউস) গ্যাসের স্তর বা চাদর। এর ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ছেড়ে দেওয়া তাপ পুনরায় ফেরত যায় না। তাপ শোষণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমশ উষ্ণতা বৃদ্ধি পেতে থাকছে। উষ্ণতা বৃদ্ধির এই প্রক্রিয়াই হলো গ্রিনহাউস প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া। মেরু অঞ্চলে কাচের ঘরে সৌরতাপ আটকিয়ে সবজি চাষ করাকে গ্রিনহাউস বলে (চিত্র ৫.১০)।

বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় মানুষের নেতিবাচক কর্মকান্ডের ফলে বায়ুমন্ডলে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট গ্রিনহাউস গ্যাসসমূহের উপস্থিতির মাত্রার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। যাকে আমরা গ্রিনহাউস প্রভাব হিসেবে চিহ্নিত করি। বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য দায়ী গ্যাসগুলো হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন। শিল্পায়ন, যানবাহনের সংখ্যাগত বৃদ্ধি, বনাঞ্চল উজাড়, পারমাণবিক পরীক্ষা ও কৃষির সম্প্রসারণ ইত্যাদি কর্মকান্ডের কারণে উল্লিখিত গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে অন্যান্য অনেক দেশের মতো বাংলাদেশে অধিক বৃষ্টিপাত, ব্যাপক বন্যা, ভয়ঙ্কার ঘূর্ণিঝড়, খরা প্রভৃতি জলবায়ুগত পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন কৌশল পৃথিবী ও তার পরিবেশকে এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশের মতো দেশসমূহকে এর বিশ্ব উষ্ণায়নের বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে পারে।

কাজ : বিদ্যালয়ে অথবা বাড়িতে ইন্টারনেটে ব্রাউজিং করে বিশ্বের জলবায়ুতে গ্রিনহাউসের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত সাম্প্রতিক তথ্যসমূহ উপস্থাপন কর।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব : বিশ্ব প্রেক্ষিত (Effect of climate change in the world)

বিশ্বের আবহাওয়া ও তার ধরন দিন দিন বদলে যাচ্ছে। কোনো ঋতুতেই আমরা প্রকৃতির কাছ থেকে স্বাভাবিক আচরণ পাচ্ছি না। বৃষ্টির সময়ে অনাবৃষ্টি, খরার সময়ে বৃষ্টি, গরমের সময়ে উত্তরে হাওয়া, শীতের সময়ে তপ্ত হাওয়া কেমন যেন এলোমেলো আবহাওয়া লক্ষ করা যায়। বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী গ্রিনহাউস প্রভাব পৃথিবীর কয়েকটি দেশে যথা–

কানাডা, রাশিয়া, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড, সুইডেন, দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি দেশগুলোর জন্য সাফল্য বয়ে আনবে। এ কারণে ঐসব অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ একর জমি বরফমুক্ত হয়ে চাষাবাদ ও বসবাসযোগ্য হয়ে উঠবে। অন্যদিকে দুর্ভোগ বাড়বে পৃথিবীর প্রায় ৪০ শতাংশ এলাকার দরিদ্র অধিবাসীদের। কারণ গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উপকূলীয় এলাকার এক বিরাট অংশ পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সমুদ্র উপকূলবর্তী পৃথিবীর বেশ কয়েকটি বিখ্যাত শহর হবে ব্যাপক আকারে ক্ষতিগ্রস্ত (চিত্র ৫.১১)।

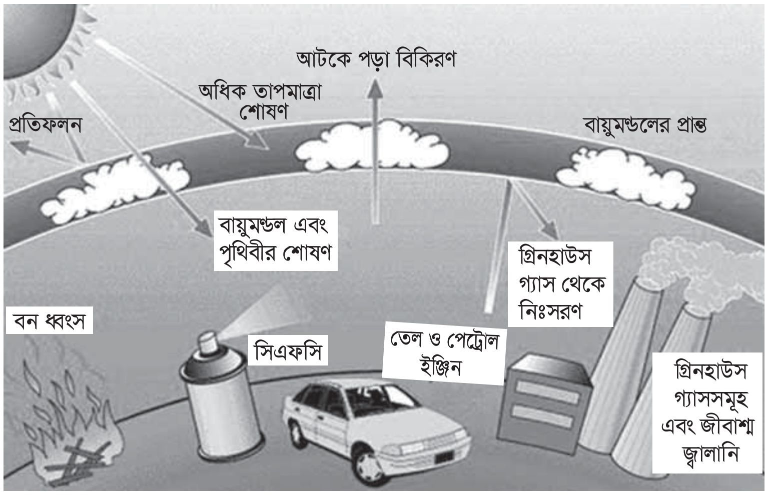

চিত্র ৫.১১ : গ্রিনহাউস প্রভাব

পৃথিবী উষ্ণায়নের ফলে একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় বিশ্বের মোট জনসমষ্টির প্রায় ২০ শতাংশ অধিবাসীর সরাসরি ভাগ্য বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠ ফুলে উঠলে আবহাওয়ার প্রকৃতিই বদলে যাবে। সময়ে অসময়ে জলোচ্ছ্বাসের শিকার হয়ে ফসল ডুবে যাবে, দূষিত হবে সুপেয় পানি, লোনা পানি প্রবেশের ঝুঁকি বাড়বে, বনাঞ্চল ধ্বংস হবে, বন্য জীবজন্তুর সংখ্যা হ্রাস পাবে এবং একই দেশের মানুষ অন্য অঞ্চলে হবে জলবায়ু শরণার্থী (Climate refugee)। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় নিম্নাঞ্চলের মানুষ হবে প্রথম শিকার।

গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া বিশ্বব্যাপী সমানভাবে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থবিরতায় এক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। উন্নত বিশ্ব তাদের উৎপাদিত শস্যের বাড়তি অংশ পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করবে, আর উন্নয়নশীল গরিব দেশগুলোর মানুষ না খেয়ে কঙ্কালসার জীবনযাপনের মাধ্যমে নিজ দেশের সীমানা পেরিয়ে পরিবেশ শরণার্থী হয়ে উঠবে। ইতোমধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক মন্দাভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং অনেক দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টি দারিদ্র্যসীমার নিচে মানবেতর জীবনযাপন করছে। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, চীন, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশের জলবায়ুর ধরন সাম্প্রতিক সময়ে সম্পূর্ণভাবে বদলে যাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার গ্রীষ্মকাল দীর্ঘতর হয়ে উঠেছে, শীতকালও পূর্বের তুলনায় বর্ষাসিক্ত হয়ে উঠেছে।

কাজ : পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কী কী দুর্ভোগের সৃষ্টি হচ্ছে তার একটি তালিকা প্রত্যেকে তৈরি কর।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত (Impact of climate change in Bangladesh)

মানুষের নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবহারের কারণে মাত্রাতিরিক্ত গ্রিনহাউস গ্যাস অর্থাৎ কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড এবং ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC) গ্যাসগুলো নির্গমনের কারণে বিশ্বে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের যে ধারা শুরু হয়েছে তাতে বিশ্বের স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল অনেক দেশ ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়বে। আর এসব দেশের মধ্যে বাংলাদেশ আছে সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে। অন্যান্য দেশ এ ক্ষতির মুখোমুখি হওয়ার আগেই বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে পড়ে গেছে। আগামী দিনগুলোতে এর মাত্রা আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। জাতিসংঘ তার সতর্কীকরণে বলেছে পরবর্তী ৫০ বছরে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৩ ফুট বাড়লে তাতে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী একটি অংশ প্লাবিত হবে এবং প্রায় ১৭ শতাংশ ভূমি পানির নিচে চলে যাবে। আনুমানিক ৩ কোটি মানুষ তাদের ঘরবাড়ি, ফসলি জমি হারিয়ে জলবায়ু উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে। ইন্টারন্যাশনাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ-এর তথ্য অনুসারে ২০৩০ সালের পর নদীর প্রবাহ নাটকীয়ভাবে কমে যাবে। ফলে এশিয়ায় পানির স্বল্পতা দেখা দেবে এবং ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় ১০০ কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। উচ্চ তাপমাত্রার প্রভাবে ঘন ঘন বন্যা, ঝড়, অনাবৃষ্টি এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। যা ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে অনুভূত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও বাড়বে।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (ADB) একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায়, উষ্ণায়নের বর্তমান ধারা ২০৫০ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকলে দক্ষিণ এশিয়ায় শস্য উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে। জলবায়ুর অন্য আনুষঙ্গিক পরিবর্তনের প্রভাবে দক্ষিণ এশিয়ার ১৫০ কোটির বেশি মানুষ সরাসরি পানি ও খাদ্য ঝুঁকিতে পড়বে। ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে এ শতকের শেষ নাগাদ বিশ্বে চাষাবাদ ২০ থেকে ৪০ শতাংশ হ্রাস পেতে পারে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলোজি (MIT) অর্থনীতিবিদদের নতুন গবেষণা অনুসারে বিশ্ব উষ্ণায়ন ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যকার ব্যবধান আরও বাড়িয়ে দেবে।

২০০৯ সালে বিশ্বব্যাংক বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য ৫টি ঝুঁকিপূর্ণ দিক চিহ্নিত করেছে। এগুলো হলো– মরুকরণ, বন্যা, ঝড়, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং কৃষিক্ষেত্রে অধিকতর অনিশ্চয়তা। এগুলোর প্রতিটিতে শীর্ষ ঝুঁকিপূর্ণ ১২টি দেশের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। সেই তালিকার ৫টি ভাগের একটিতে শীর্ষ ঝুঁকিপূর্ণসহ ৩টিতে নাম আছে বাংলাদেশের। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে বাংলাদেশ (সারণি ২)।

সারণি ২ : বৈশ্বিক ঝুঁকিতে থাকা পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ১২টি করে দেশের তালিকা

মরুকরণ	বন্যা	ঝড়	সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি	কৃষিক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা
মালাউয়ি	✻বাংলাদেশ	ফিলিপাইন	সব নিচু দ্বীপদেশ	সুদান
ইথিওপিয়া	চীন	✻বাংলাদেশ	ভিয়েতনাম	সেনেগাল
জিম্বাবুয়ে	ভারত	মাদাগাস্কার	মিসর	জিম্বাবুয়ে
ভারত	কম্বোডিয়া	ভিয়েতনাম	তিউনিসিয়া	মালি
মোজাম্বিক	মোজাম্বিক	মলডোভা	ইন্দোনেশিয়া	জাম্বিয়া
নাইজার	লাওস	মঙ্গোলিয়া	মৌরিতানিয়া	মরক্কো
মৌরিতানিয়া	পাকিস্তান	হাইতি	চীন	নাইজার
ইরিত্রিয়া	শ্রীলঙ্কা	সামোয়া	মেক্সিকো	ভারত
সুদান	থাইল্যান্ড	টোঙ্গা	মিয়ানমার	মালাউয়ি
শাদ	ভিয়েতনাম	চীন	✻বাংলাদেশ	আলজেরিয়া
কেনিয়া	বেনিন	হন্ডুরাস	সেনেগাল	ইথিওপিয়া
ইরান	রুয়ান্ডা	ফিজি	লিবিয়া	পাকিস্তান

উৎস : বিশ্বব্যাংক, ২০০৯

ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে ৭-১৮ই ডিসেম্বর, ২০০৯ জাতিসংঘের বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে অংশ নেওয়া ১৯৩টি দেশের মধ্যে ১৮৯টি দেশ কোপেনহেগেন তিন পৃষ্ঠার অঙ্গীকারনামাকে একটি নোট হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। অঙ্গীকারনামায় জাতিসংঘের আন্তঃসরকার জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত প্যানেলের (IPCC) ২০০৭ সালে প্রকাশ করা চতুর্থ মূল্যায়ন প্রতিবেদনের তথ্য উল্লেখ করে বলা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ২° সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। খসড়ায় ২০১০-১২ সালের জন্য ৩ হাজার কোটি ডলারের একটি তহবিলের কথা বলা হয়েছে। জলবায়ু তহবিলের অর্থ বনায়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সক্ষমতা অর্জনের জন্য ব্যয় করা। ফলে এই তহবিলের অর্থ দরিদ্র দেশগুলোর পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশ যেমন– চীন, ভারত ও ব্রাজিল পাবে। জাতিসংঘ একে রাজনৈতিক সমঝোতা হিসেবে উল্লেখ করে।

কাজ : সারণি ২-তে বৈশ্বিক ঝুঁকিতে থাকা পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ১২টি করে দেশের তালিকায় এশিয়ার অন্য দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ কতটুকু হুমকিতে রয়েছে, তা বিশ্লেষণ কর (দলগতভাবে)।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আরগন গ্যাসটি বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে থাকে?

(ক) স্ট্রাটোমণ্ডল
(খ) ট্রপোমণ্ডল
(গ) এক্সোমণ্ডল
(ঘ) তাপমণ্ডল

২। স্ট্রাটোমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য হলো, এটি–

i. আর্দ্র বায়ুযুক্ত
ii. বিমান চলাচলের উপযোগী
iii. অতিবেগুনি রশ্মি শোষণে সক্ষম

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) ii ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

অনন্য তার বাবার সঙ্গে সিলেটে বেড়াতে যায়। সেখান থেকে তারা জয়ন্তিয়া পাহাড় দেখতে গেল। দূর থেকে দেখল পাহাড়ের একটি ঢালে বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু বিপরীত ঢালে বৃষ্টি হচ্ছে না।

৩। অনন্য কোন ধরনের বৃষ্টিপাত দেখেছিল?

(ক) পরিচলন

(খ) শৈলোৎক্ষেপ

(গ) ঘূর্ণি

(ঘ) বায়ুপ্রাচীরজনিত

৪। পাহাড়ের অপর ঢালে বৃষ্টি না হওয়ার কারণ–

i. বায়ুতে জলীয়বাষ্পের অভাব

ii. বায়ু উষ্ণ ও শুষ্ক হাওয়া

iii. বায়ুতে জলীয়বাষ্প বৃদ্ধি হওয়ায়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

৫। বায়ু সর্বদা একস্থান থেকে অন্যস্থানে প্রবাহিত হয় কেন?

(ক) বায়ুর গতিপথে পর্বতের অবস্থানের জন্য

(খ) তাপ ও চাপের পার্থক্যের জন্য

(গ) চাপ বলয়ের অবস্থান পরিবর্তনের জন্য

(ঘ) নিরক্ষীয় নিম্ন ও উচ্চচাপ বলয়ের জন্য

৬। বাংলাদেশে সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ু নিয়মিত প্রবাহিত হয় কেন?

(ক) স্থলভাগের পরিমাণ বেশি হওয়ায়

(খ) উত্তরে হিমালয় পর্বত থাকায়

(গ) দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থান করায়

(ঘ) নদীমাতৃক দেশ হওয়ায়

৭। মৌসুমি বায়ুর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো–

i. এটি একটি আঞ্চলিক বায়ু

ii. ঋতু আশ্রয়ী বায়ু

iii. শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুভেদে এ বায়ুর দিক পরিবর্তন হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

৮। নিম্নের কোন ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ বৈশ্বিক ঝুঁকির অন্তর্ভুক্ত?

(ক) কৃষিক্ষেত্রে নিশ্চয়তা

(খ) ভূমিকম্প

(গ) তাপমাত্রা বৃদ্ধি

(ঘ) মরুকরণ

সৃজনশীল প্রশ্ন

১।

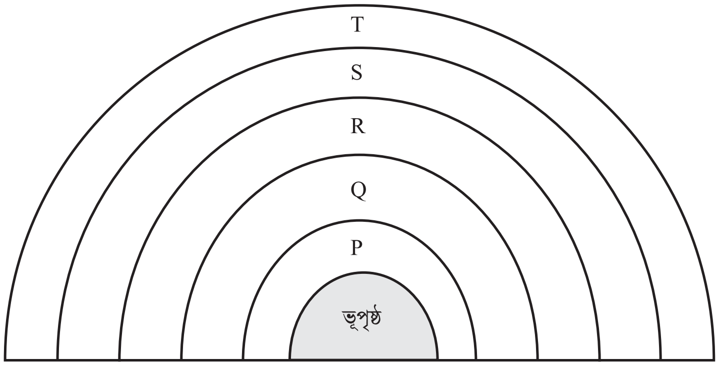

ক. বায়ুমণ্ডল কী?

খ. বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন গ্যাস বেশি পরিমাণে থাকার সুবিধা কী বর্ণনা কর।

গ. ‘Q’ স্তরটির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘R’ এবং ‘S’ স্তরের মধ্যে কোনটি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

২।

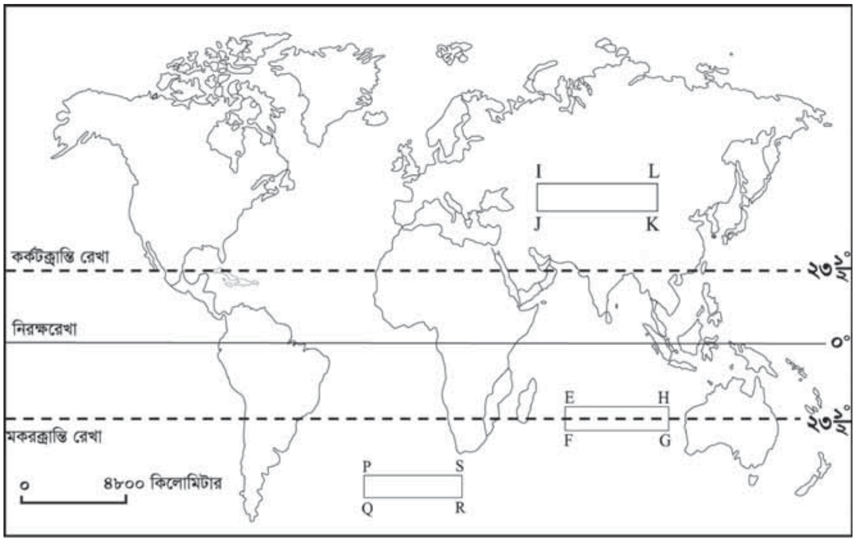

ক. খামসিন কী?

খ. ফেরেলের সূত্রটি লেখ।

গ. মানচিত্রে ‘EFGH’ স্থানে বিরাজমান বায়ুপ্রবাহ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘IJKL’ এবং ‘PQRS’ স্থানের বায়ুর বেগ কি একইরকম? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর।